সোশাল রিয়ালিটির বাস্তবতা অভিযান

কলোনিয়াল পোর্ট্রেট থেকে ডেভেলাপমেন্ট ডিসকোর্স

নাঈম মোহায়মেন

শুরু করি সোশাল রিয়ালিজম ফটোগ্রাফির সংজ্ঞা দিয়ে। বাস্তব ঘটনা বা পরিস্থিতি বা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরে রাখা, অলঙ্কার এবং এক্সাজেরেশান ছাড়া। ছবিটার উদ্দেশ্য কোন একটা বিষয় নিয়ে আমাদের নাড়া দেওয়া, বিবেককে জাগিয়ে তোলা। ছবি দেখার পরে আমরা এই বিষয়ে সজাগ হয়ে কোন একটা ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণিত হব। বাস্তুহারার ঘরের ব্যবস্থা, কয়লা খনির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এইচআইভি রোগীর নিরাপত্তা, ইত্যাদি।

অর্থাৎ সোশাল রিয়ালিজম ফটোগ্রাফির একটা কিনেটিক গতি আছে। ছবি দেখব, দেখে সজাগ হব, এবং শেষে কোন একটা কাজ করতে অনুপ্রাণিত হব। কিন্তু এই কথাগুলো লিখতে লিখতেই চিন্তা করি যে, এই সরল সংজ্ঞার সাথে মেলে না এরকম বহু কাজ আছে যা এই ধারার ভেতরে পড়ে। ক্রমশ প্রকাশ...

কলকাতায় একজন শিক্ষকের বাসায় রাতে আড্ডা চলছিল। তার বসার ঘরের দেয়ালের প্রতিটা স্কয়ার-ইঞ্চিতে ফ্রেম করা ছবি। নানারকম পোর্ট্রেট, কিন্তু এক ছবির সাথে আরেক ছবির কোন মিল নাই। আমি ভাবলাম, হয় ভদ্রলোকের পরিবারে নানা বর্ণ এবং শ্রেণীর লোকের আন্তঃবিবাহ হয়েছে, অথবা ফুটপাত থেকে কেনা ছবি। একেকটি ছবির দিকে আঙুল তুলে সে ছবির পাদটীকা দেওয়া শুরু করল। মাঝখানের একটা ছবিতে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে আছে। এই ছবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল, 'এই ছবির মধ্যে একটা রহস্য আছে, কেউ বলতে পারবে সেটা কি?'

আমরা সবাই রহস্য উদ্ঘাটন করতে লেগে গেলাম। একেক জনের একেক থিওরিঃ

‘ভদ্রলোক বোধহয় মুসলমান, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে ঘরছাড়া হয়েছে।’

‘কোন একটা নবাব পরিবার, কিন্তু এখন জমিজমা হারিয়ে রাস্তায় বসেছে।’

‘ভদ্রমহিলা অ্যাঙ্গলো, অর্থাৎ বাবা সাদা পরিবার থেকে। তাই এদের বিয়ে ছিল খুব কলঙ্কের।’

আমি এবার আমার হাইপোথেসিস দিলামঃ ‘আমি লক্ষ করছি ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বেশ জাপটে ধরে আছে। তখনকার দিনে এমন শারীরিক বহিঃপ্রকাশ জনসমক্ষে হত না। স্ত্রী না হয়ে গোপন প্রেমিকা হতে পারে?’

বাড়ির মালিক মুচকি হেসে এবার বললঃ ‘আপনাদের কারও অনুমানই ঠিক না। রহস্যটা খুলে বলি। ভদ্রমহিলা মৃত। মারা যাবার পরে এই ছবি তোলা হয়েছে। শেষ চিহ্ন বা শেষকৃত্যে হিসাবে। এখন কেন জীবিত অবস্থায় ছবি তোলার চিন্তা কেউ করল না, সে আরেক রহস্য।’

এবার বুঝলাম কেন ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে জাপটে ধরে আছে। মৃতদেহটি যাতে পড়ে না যায়!

এই ছবির ব্যাপারে যদি আরও গবেষণা করা যায়, তবে অনেক লুকনো তথ্য বেরিয়ে আসবে। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে মৃত মানুষের এই ধরনের ছবি তোলার রীতি চালু ছিল, ‘মেমেন্টো মরি’ নামে। কিন্তু সেটা কেন এবং কিভাবে ভারতে চলে আসল? মৃতদেহ চিতায় পোড়াবার আগে মুখের ছবি তুলে রাখার প্রামাণিক চিহ্ন আমরা পাই কিন্তু; ‘মেমেন্টো মরি’-তে বাড়তি একটা ট্যাক্সিডারমি জাতীয় প্রথা যুক্ত হয়েছে। এমনও কি হতে পারে যে মহিলা জীবিত অবস্থায় ছবি তুলতে রাজি হয়নি, ‘আত্মা নিয়ে যাবে’ কুসংস্কারের কারণে? এত কিছু গবেষণা করার পরে এই ছবি কি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির আওতায় পড়ে, নাকি অন্য কিছু? আর্কিওলজি? হারানো ট্র্যাডিশন? মঞ্চায়ন?

রিয়ালিজম নিয়ে ভাবতে গেলে অনুরূপ বহু প্রশ্ন মাথায় আসে।

বঙ্গভঙ্গ এবং কলোনিয়াল ফটো ধারায় ছেদ

সুকুমার রায়ের সাহিত্যিক পরিচয় ছাড়াও উপমহাদেশে ছবি তোলার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। ছবি তোলার পাশাপাশি সুকুমার রায় ছবি নিয়ে অনেক লেখালেখিও করেছেন। ফটোগ্রাফির রিয়ালিটির গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

‘কোন সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, কিরূপে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে দমন করা যায়, সেগুলিকে বর্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা ফোকাস করিবার সময় স্পষ্টতার ইতর বিশেষ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।’[১]

ধরে নিতে পারি যে, সুকুমার রায় ছবির বস্তুর মধ্যে ‘যা আছে তাই দেখাও’ এবং ‘বাড়তি অলঙ্কার পরিহার করো’ এই দুই সেন্টিমেন্টের মাঝখানে থাকতে চেয়েছেন। এটা আরও পরিষ্কার হয় যখন অন্য লেখায় দেখি যে সুকুমার রায় কিউবিজমের ‘রিয়ালিটি থেকে পলায়ন’-এর সমালোচনা এবং পশ্চিমা ‘রিয়ালিটি ট্র্যাডিশন’-এর তারিফ করেছেন।

১৯৫৬ সালে ‘ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল’-এর ১০০ জন সদস্যের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিল বাঙালি। সেই সময়ের, এবং পরবর্তী যুগের নামের তালিকায় মুসলমান ফটোগ্রাফার খুবই কম ছিল। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র

দু তিনজন নওয়াব– যেমন নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহ এবং নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির মধ্যে যে সোশাল রিয়ালিজমের ছাপ দেখা যায়, তার মূলধারা কোথা থেকে আসল সেটা অনুসন্ধান করতে গেলে এসব ব্যাপারের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। যেমন, যদি ধরে নেই যে সেই সময়ে ফটোগ্রাফি একটা ব্যয়বহুল কাজ ছিল, তাহলে এটা অনুমান করতে পারি যে বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর মধ্য থেকেই এর প্রধান প্র্যাক্টিশনাররা বেরিয়ে আসে। তাদের এক বড় অংশ যেহেতু কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য, দেশভাগের পর তারা পশ্চিমবাংলায় থেকে যায়। ফটোগ্রাফারদের গোত্র বা ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা তারা কোন বঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তা অনুমান করা হয়। আবার যেহেতু মুসলমান ফটোগ্রাফাররা নওয়াব পরিবার থেকে এসেছিল, তাই তাদের কাজও পূর্ববাংলার (নন-এলিট) মূলধারার কাছে দৃশ্যমান ছিল না। ফলে কলোনিয়াল ফটোগ্রাফির যে ধারাটা তৈরি হয়ে আসছিল, ১৯৪৮ সালের পরে তা পূর্ববঙ্গের কাছে হারিয়ে যায়।

কলোনিয়াল যুগে যারা ফটোগ্রাফি প্রথম শুরু করে, তাদের কাজ পোর্ট্রেট ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৩ সালে আদীশ্বর ঘটকের ফটোগ্রাফি শিক্ষা (২য় সংস্করণ) থেকে আমরা জানি যে, দামি অয়েল পেইন্টিং (১০০০-২০০০ টাকা)-এর বদলে ফটোগ্রাফি স্টুডিও ১০০ টাকা দামে 'অবিকল' পোর্ট্রেট তুলে দিচ্ছিল। এমনকি রাস্তার ফটোগ্রাফাররা আট আনা দামেও গ্লাস পজিটিভ পোর্ট্রেট করে দিত[২]। এবার হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরির তোলা বাঁশি বাজানো অবস্থায় কাজী নজরুল ইসলামের আলোকচিত্রের (১৯২৬) দিকে তাকাই। ছবিটার পটভূমি স্টুডিওর বাইরে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য– এটা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এছাড়া ছবিটা মূলত একটা পোজ করা পোর্ট্রেট। এর কাছাকাছি সময়ে আমেরিকার ডাস্ট–বোল এলাকায় অতিগরিব, প্রান্তিক, সাদা আমেরিকানদের যে ছবিগুলো তোলা হচ্ছিল, সেগুলো পোর্ট্রেট ফর্মে হলেও আসলে সোশাল রিয়ালিজমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমেরিকায় ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড বৈষম্যের বিষয়ে জোরালো সাড়া জাগায় এই ছবিগুলো। সেই প্রেক্ষিতে নজরুলের আলোকচিত্রটি বিবেচনা করলে এখন মনে হয়ঃ নজরুল উইদাউট পলিটিক্স। অনুরূপভাবে চিন্তা করা যায় হেমেন্দ্রমোহন বসুর তোলা রবীন্দ্রনাথের অটোক্রোম প্রসেস রঙিন ছবি (১৯১২)। একটা গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট্রেট এবং ডকুমেন্ট। কিন্তু আবারও সেই চিন্তা– রঙিন ছবির যোগ্য সাবজেক্ট শুধু বিখ্যাত মানুষ। এর মাঝে ব্যতিক্রম খুঁজে পাই এইচ বোসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং যামিনী রায়ের মাঠে রাখালের ছবির মধ্যে।

সুকুমার রায়ের কাছে ফিরে যাই। তিনি ফটোগ্রাফিতে রিয়ালিজম দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর এই ধারার কাজের হদিস খুব একটা মেলেনি। এগুলো ঠিকমত পাওয়া গেলে বাংলার রিয়ালিজমের ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরীকে হয়ত পাওয়া যেত। আনন্দমেলা পত্রিকার একটা সংখ্যায় সুকুমার রায়ের তোলা মন্বন্তর-এর ছবি ছাপা হয়েছে। এই ছবির ব্যাপারে ঢাকা ভার্সিটির ফাইন আর্টস বিভাগের পেইন্টিংয়ের শিক্ষক প্রফেসর নিসার হোসেনের সাথে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, বাংলার বড় দুই মন্বন্তরের সময়ে (১৭৭০ এবং ১৯৪৩) সুকুমার রায় বেঁচে ছিলেন না। তাহলে এই ছবিগুলো আসল কোথা থেকে? কোন বছরের মন্বন্তর? নিসার হোসেনের ধারণা ছবিগুলো হয়ত শিশির ভাদুড়ির পরিচালনায় মন্বন্তর সম্বন্ধে একটা মঞ্চ নাটকের ছবি। বোধ হয় সেজন্যই ছবিগুলোর সাবজেক্টদেরকে বেশ সাজানো গোছানো মনে হয় (ছোট্ট পাদটীকাঃ সুকুমার রায়ের এই ছবিগুলো মনে করিয়ে দেয় আমানুল হকের তোলা সত্যজিৎ রায়ের সেই ছবিটির কথা– রবীন্দ্রনাথের তথ্যচিত্রের নৃত্যনাট্যের দৃশ্য)[৩]। তাহলে এটা কি সোশাল রিয়ালিজম? সুকুমার রায় যদি ক্ষুধার রাজ্যকে রিপ্রেজেন্ট করতে চান, এবং তার কাছে উপাদান হিসাবে থাকে

ছবিঃ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরি, কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯২৬

শুধু এই নাটক– সেক্ষেত্রে এটাকে এক ধরনের রিয়ালিজম বলা যায়, যেটা হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, ওয়ার্কিং উইদিন দ্যা এক্সট্রিম লিমিটেশন অফ রিয়ালিটি।

জয়নুল এবং শিল্পী-প্যাট্রনের সম্পর্কে ভাঙ্গন

পূর্ব বাংলার ফটোগ্রাফিতে বাস্তবতার আগমনের বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গেলে পেইন্টারদের প্রসঙ্গটা চলে আসে, বিশেষ করে জয়নুল এবং পরবর্তীতে কামরুলের ভূমিকা। এখানে কলোনিয়াল আমলের ফটোগ্রাফারদের লেগাসি নিয়ে বিড়ম্বনাটা আরেকটু তীক্ষ্ম হয়। দেশ বিভাগের আগে যে ফটোগ্রাফির ধারা চালু ছিল তা যথেষ্টভাবে এই বাংলার ফটোগ্রাফিকে রিয়ালিজমের দিকে টেনে নিতে পারেনি (যদিও কিছু ফটোগ্রাফি স্টুডিও স্থাপন হয়েছিল)। এবং এই শূন্যতার কারণেই জয়নুলের কাজের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জয়নুলের ভূমিকার কথা বলতে গেলে মন্বন্তরের কাজটি ('ফ্যামিন সিরিজ') ভালমত বুঝতে হবে, এবং বিশেষত সেই সময়কার প্রচলিত চারুকলায় এর প্রভাবটাকে খতিয়ে দেখতে হবে। সেই সময়ের প্রচলিত ধারার ব্যাপারে শোভন সোম লিখেছেনঃ

'অ্যাকাডেমিক কেতার পুরোধা শিল্পীদের ছবিতে বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেত নগ্নিকা, অভিজাত বা ধনবান মানুষের অজুরায় আঁকা প্রতিকৃতি এবং অজুরায় আঁকা নানা বিষয়ের ছবি। বলা বাহুল্য, যেহেতু ছবি আঁকাই তাদের জীবিকার উপায় ছিল এবং সে সময় মুষ্টিমেয় ক্রেতাদের মধ্যে ছিলেন দেশীয় রাজণ্যবর্গ, জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বা বণিক এবং এই ক্রেতাদের রুচিমাফিক না আঁকলে জীবিকার সুরাহা সম্ভব ছিল না, এ কারণে এই শিল্পীদের পক্ষেও নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে পা ফেলা কঠিন ছিল। ঐ সব বিষয় ছাড়াও এরা এক ধরনের দৃশ্যচিত্র আঁকতেন যা ছিল রোম্যান্টিক আবেগে আপ্লুত, যেমন ঘনায়মান সন্ধ্যায় প্রান্তরে নামাজি, বনান্তরালে পল্লিবধূ, গোচারণ শেষে গো-পালসহ রাখালবালক, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বাস্তবতাবর্জিত এই সব রোমান্টিক ছবির লক্ষ্য ছিল এক বিশেষ ধরনের ক্রেতা।'[৪]

এই প্রেক্ষিতটা লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, সেই সময়কার শিল্পীরা বাইরের পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবকে নিজেদের কাজে জায়গা দিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, কলকাতায় বিদেশি সৈন্যের আনাগোনা, গ্রামে গ্রামে ক্ষুধার্ত মানুষ না খেয়ে মরছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে যামিনী রায় আঁকছে যিশু ও কৃষ্ণলীলার ছবি, যার খদ্দের কলকাতার উচ্চবিত্ত মানুষ অথবা আগন্তুক মার্কিন ও ইংরেজ সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার। একই সময়ে ক্যালকাটা গ্রুপ বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিয়ে বরং দলীয় কর্মীশিল্পী চিত্তপ্রসাদ, সূর্য রায়, রথীন মৈত্র ও সোমনাথ হোরকে পোস্টার আঁকার কাজে আটকে রেখেছে। এমনকি নীরদ মজুমদারকে কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ তৈরির কাজে ব্যস্ত রাখা হয়।

এই নির্লিপ্ত শিল্প পরিস্থিতিতে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি কলকাতার ভদ্রলোক সমাজে একটা হাতবোমার মত বিস্ফোরিত হয়। শোভন সোমের ভাষায়ঃ

'জয়নুলের ছবিতেও আমরা প্রতিবাদ দেখি না; যে সমাজব্যবস্থা এই দুর্ভিক্ষ তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে একটাও উত্তোলিত তর্জনি নেই। তার বিপ্রতীপে আছে নীরবে নিয়তিকে মেনে নেওয়া, আছে প্রতিবাদহীন মৃত্যু, কিন্তু প্রশ্ন নেই। তাঁর ছবির সামনে দাঁড়ালে দর্শক ভাবতে বাধ্য হন, কেন বিনা প্রশ্নে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এই পরিণাম মেনে নিল। আমরা দর্শক হিসাবে ভাবতে বাধ্য হই, যুগ যুগ ধরে এই দেশ কেন এইভাবে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। আর তখনই আমরা তাঁর ছবিতে নিজেদের স্বরূপ দেখে অনুভব করি যে, এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁর ছবিতে যা প্রতিবাদহীনতা বলে প্রতিভাত হয় বস্তুত তা প্রতিবাদকেই উসকে দেয়।'[৫]

জয়নুলের দুর্ভিক্ষ সিরিজের রূঢ়, মোটা, উগ্র, ড্রাই ব্রাশ স্ট্রোকগুলো নতুন এক ভাষার ইঙ্গিত দেয়। আলোচকরা বলেন যে, এই কাজের মধ্যে উঁচিয়ে ধরা মুঠিটা নেই। কিন্তু রাগ আছে প্রচুর। ভিক্ষুক, কুকুর, কাক এক জায়গায় মিলে গেছে ছবিগুলোতে। তাদের খাদ্য সন্ধানের স্থান এবং মৃত্যুর জায়গা মিলেমিশে আছে। হয়ত এক প্রজাতি মরলে সে অন্যের খাবারে পরিণত হবে। কলকাতার শিল্পমহল জয়নুলের কাজ দেখে হতবাক হয় শুধু সোশাল রিয়ালিজমের থাপ্পড়ের জন্য নয়। তার সাথে যুক্ত হয় এই চিন্তাঃ 'এ কোথা থেকে এল, আমাদের প্রভাবের চিহ্ন পাচ্ছি না কেন?' অনেকে তাকে বাক্সবন্দি করার জন্য 'সোশাল রিয়ালিস্ট মুসলিম' বলে আখ্যায়িত করে।

ছবি: জয়নুল আবেদিন, দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৪, কালি ও তুলি, ১৯৪৩

জয়নুলের সেই বড় ভাঙনের পর ফিরে যাবার পথ আর থাকে না। তার অনুগত কামরুল হাসান ও সফিউদ্দিনের কাজের সমন্বয়ে পেইন্টিংয়ের রোমান্টিক অতীতের সাথে একটা ভাঙন হয়ে যায়। ভারত বিভাগের পরে জয়নুল প্রভাবিত রিয়ালিজম পূর্ব পাকিস্তানের পেইন্টিংয়ে ঢুকে যায়। আমার ধারণা, এই জয়নুল স্কুল থেকেই রিয়ালিজমের ধারাটা ফটোগ্রাফির মধ্যে চলে আসে (বা, অনেকগুলো প্রভাবের মধ্যে একটা)। যেহেতু পূর্ববঙ্গের আলোকচিত্রে কলোনিয়াল বেঙ্গল ধারাটা দেশবিভাগের কারণে হারিয়ে যায়, ৫০ ও ৬০ দশকের ফটোগ্রাফি সেই কলোনিয়াল ধারাকে উপেক্ষা করে বরং চারুকলার জয়নুল ও অন্যান্যের প্রভাব গ্রহণ করে। পরের দশকের ফটোগ্রাফিতে বাস্তবতার উপস্থাপন জয়নুলের সেই 'ফ্যামিন' সিরিজের পরবর্তী ধাপ হিসাবে ভাবা যায়। যাত্রাপথে কোন এক সময়ে জয়নুলের এগ টেম্পেরা হয়ে যায় নাইব উদ্দিনের নেগেটিভ।

নাইব উদ্দিন ও জয়নুলের চাকা; আনোয়ার হোসেন ও নকশী কাঁথা

পাকিস্তান আমলে খুব সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও যে কয়জন ফটোগ্রাফার পূর্ববাংলায় কাজ করতে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোলাম কাশেম ড্যাডি, আজমল হক, আমানুল হক, নাইব উদ্দিন আহমেদ, কফিল উদ্দিন

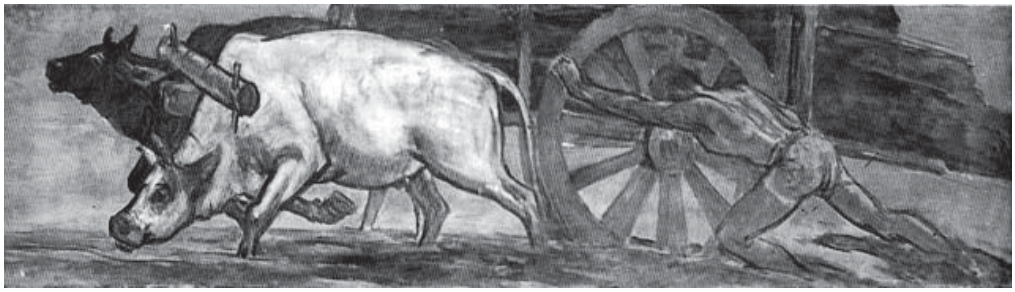

ছবিঃ জয়নুল আবেদিন, সংগ্রাম, ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৭৬

আহম্মদ, এম. এ. বেগ, আনসার উদ্দিন আহমদ, বিজন সরকার, নওয়াজেশ আহমদ, সৈয়দ আনিসুল হোসেন, গোলাম মুস্তফা ও আনোয়ার হোসেন[৬]। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, ড্যাডির কাজ পূর্ব বাংলার মুসলমান ফটোগ্রাফারদের আদি নিদর্শন। অবশ্য এখানেও পার্টিশানের কারণে কিছু 'কিন্তু' চলে আসে। ড্যাডি মূলত পশ্চিম বাংলার লোক, এবং তার কাজের এক বড় অংশ ঐ স্থানেই তোলা। যেমন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তার তোলা বাঁকুড়ায় ভারতীয় সৈন্যের ছবি (১৯১৮)[৭] বা ১৯২৫ সালের 'শিপ অ্যাট পোর্ট'। অবশেষে ১৯৫৪ সালে সে পোস্ট অফিসের একটা চাকরি নিয়ে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে, এবং পরে ক্যামেরা রিক্রিয়েশান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে এই বাংলায় বহু নতুন আলোকচিত্রীকে উদ্দীপিত করে।

এই সময় দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের আলোকচিত্রীরা পোর্ট্রেটের চাইতে গ্রাম-বাংলার ছবি তুলতে বেশি উৎসাহী। আবার ছবিগুলো সবই যে রিয়ালিজম ট্র্যাডিশনের মধ্যে তা বলা ঠিক হবে না। নাইব উদ্দিন আহমেদের অনেকগুলো ছবি দেখলে বোঝা যায় যে মানুষকে পোজ করতে বলা হয়েছে। যেমন 'ফ্রুট অফ টয়েল'– ঠিক ওইভাবে রোগা কৃষক ধানের গোছা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে? পোজ করা হোক অথবা ডিসাইসিভ মোমেন্টই হোক, উদ্দেশ্য হচ্ছে রিয়ালিটিকে ধারণ করা; তবে খুব রোমান্টিক একটা দৃষ্টি দিয়ে (যা পরবর্তী দশকে আর টিকে থাকে না)।

নাইব উদ্দিন সম্পর্কে বলা হয়, জয়নুল আবেদিনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার কারণে '৭১-পূর্ব ফটোগ্রাফির মধ্যে রিয়ালিস্ট ধারাটা চলে এসেছে। পাঠশালায় মুনেম ওয়াসিফ একটা আলোচনায় জয়নুল আবেদিনের সেই কাদায় আটকে পড়া চাকার পেইন্টিং ('দ্য স্ট্রাগল') এবং তার পাশাপাশি নাইব উদ্দিনের তোলা ফটো[৮] দেখিয়ে দর্শকদেরকে প্রশ্ন করেঃ কোন কাজটা আগের? কে কাকে উদ্দীপনা দিয়েছে?

আবেদিনের পেইন্টিং দেখে নাইব উদ্দিন কি বেরিয়ে গিয়েছিল অনুরূপ একটা চাকা খুঁজতে? নাকি জয়নুল নাইব উদ্দিনের ফটো ব্যবহার করেছিল ইন্সপিরেশনের জন্য? যেহেতু সাবধানে তারিখ লিপিবদ্ধ করার চল বাংলাদেশে কম, তাই কোন কাজটি আগে এসেছিল এটা নির্ণয় করা কষ্টকর। পেইন্টিংটার আদি রচনাকাল নিয়ে একটা ছোট বিতর্ক বিরাজমান। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মিডিয়াম (এগ টেম্পেরা, তেলচিত্র) এবং নাম ('দ্য স্ট্রাগল', 'লাইফ', 'জীবন সংগ্রাম')-এর জটিলতা দেখা দিয়েছে। পরবর্তীতে শাওন আকন্দ[৯] এই ব্যাপারে নতুন গবেষণা করেছে। পাকিস্তানী খবর পত্রিকায় ১৯৫৪ সালে ছাপানো ছবি, এবং আলতাফ গওহর (১৯৫৪),

ছবি: নাইব উদ্দিন আহমেদ, চাকা

নজরুল ইসলাম (২০০৫), সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৫) ও নিসার হোসেন (২০০৯)-এর লেখা পর্যবেক্ষণ করে আকন্দ প্রস্তাব করেছে, মূল সৃষ্টিকাল ১৯৫৪ । নাইব উদ্দিনের ফটোটা তার আগেই তোলা– সুতরাং কজালিটির দিকঃ ফটোগ্রাফি থেকে পেইন্টিং ।

ডিপার্ট পত্রিকায় সম্প্রতি বলা হয়েছে, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময়ে জয়নুল আর নাইব উদ্দিন এক সাথে বেরিয়েছিল কলকাতার রাস্তায়[১০] । কিন্তু নাইবের ফটোগুলোর হদিস পাওয়া যায়নি, তাই 'সংগ্রাম' ছবিটি এই দুই শিল্পীর একসাথে কাজ করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দলিল । একথা নিশ্চিত যে, জয়নুল ও কামরুলের সাথে ওঠা-বসার কারণে শুধু নাইব উদ্দিনই নয়, অন্য ফটোগ্রাফাররাও অনুপ্রাণিত হয়েছে । এই সময়ের কিছু

ছবি: মনজুর আলম বেগ, শ্রম

আইকনিক আলোকচিত্র দেখলে প্রভাবের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এম. এ. বেগের 'শ্রম' ছবিটা একটা ভাল উদাহরণ। একজন শ্রমিকের লুঙ্গি কাছা করে হাঁটুর অনেক উপরে ওঠানো, তার সারা পায়ে চুনা জাতীয় দাগ। চুনা কেন বলছি, মাটিও হতে পারে– ছবিটা সাদাকালো, সুতরাং পদার্থের উৎপত্তি বোঝা কঠিন। লোকটা অনেকটা অ্যাটেনশান হয়েই দাড়িয়ে আছে, কিন্তু কোমরের পেছনে দুই হাত রাখা বলেই মিলিটারি পোজটা ভেঙে গেছে। শ্রমিক হয় বিশ্রাম করছে, অথবা বেগের ক্যামেরার জন্য বিনয় সহকারে পোজ দিচ্ছে। (বা, বিরক্তিও থাকতে পারে: 'লন ভাই, শেষ করেন, ম্যালা কাজ আছে।') এই ছবিটা যখন দেখি, বারবার ভাবি এম. এ. বেগ কোন একটা ক্লাসিক্যাল পেইন্টিং দ্বারা উদ্দীপিত। কিন্তু সেই সৌন্দর্য চর্চা চলে এসেছে রূঢ় বাস্তবতার চিত্রায়ণে। আর ফটোগ্রাফি যেহেতু 'আসল ঘটনা' দেখাবার অঙ্গীকার করে, তাই এই বাস্তবতা দর্শককে 'কিছু একটা করতে হবে' চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়।

রিয়ালিজমের আরেকটা ধারা হল ফটো সাংবাদিকতা। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ধারায় কাজ করেছে বিশেষ করে ইয়াকুব আহমদ, মিজানুর রহমান, ওবায়দুর রহমান ফিরোজ, মোজাম্মেল হোসেন,

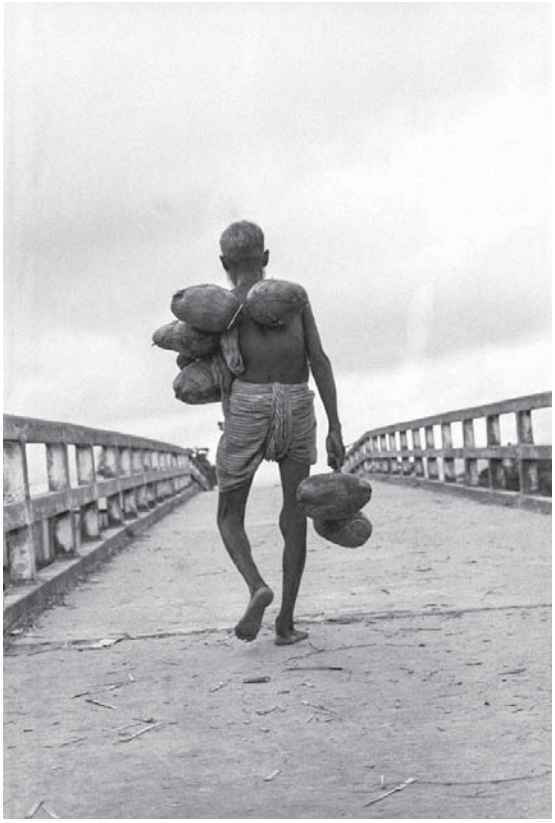

ছবি: আনোয়ার হোসেন, টু দ্যা মার্কেট

শামছুল হুদা, মোশাররফ হোসেন, গোলাম মাওলা, আফতাব আহমদ, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, রশীদ তালুকদার, মঞ্জুর আলম চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন বুলু, মনোয়ার আহমেদ, উমেষ বড়ুয়া, মানু মুনশী, মোহাম্মদ আলম এবং জহিরুল হক[১১]। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ঘটনা, ছাত্র আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, সেনা সরকারের পতন, স্বাধীনতা যুদ্ধ– সবই ধরা পড়েছে আলোকচিত্রীর ক্যামেরায় (তাদের সমসাময়িক আর্ট কলেজের শিল্পীরা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, নাটক, ইত্যাদি তৈরি করে গণ অভ্যুত্থানে যুক্ত ছিল)। এই সময়ে তোলা ফটোগুলা খুবই স্বতঃস্ফূর্ত এবং গতি-সঞ্চালক। যেমন আমানুল হকের তোলা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে গুলিবিদ্ধ, ছিন্নভিন্ন শহীদ রফিকের মাথা। কোন এক ধরনের ফ্যানা অথবা অন্য কোন বিমূর্ত প্যাটার্নে রক্তমাংস ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। হেডলাইনের রিয়ালিটি, ঘটনা দ্বারা পরিচালিত।

১৯৭১ এর যুদ্ধের সময়ে বাংলার গ্রামের বিউকলিক ছবি তোলার সম্ভাবনা আর থাকে না। তখন যে কয়জন আলোকচিত্রী বিপদ এড়িয়ে ছবি তুলতে পেরেছে, তাদের মধ্যে জালালুদ্দিন হায়দার, ক্যাপটেন বেগ (সংগ্রহঃ এম. এ. বেগ), রশীদ তালুকদার, আফতাব আহমদ, মোহাম্মদ শফি, মোহাম্মদ আলম, মাহাবুব আলম খান

এবং আব্দুল হামিদ রায়হানের কাজ কিছুটা সংরক্ষিত আছে। আলোকচিত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে দৃকের ১৯৯৬ ক্যালেন্ডারে লেখা আছেঃ 'তাদের সকলে বন্দুক ধরেনি। কেউ রুটি বানিয়েছে, কেউ গান গেয়েছে, কেউ ছবি তুলেছে। এই বাংলাদেশ তাদের সকলেরই, এই মনে করিয়ে দেয়া মাত্র।'[১২]

৬০-এর দশকের শেষে আনোয়ার হোসেন ছবি তোলা শুরু করে, এবং প্রথম থেকেই তার কাজে সোশাল রিয়ালিস্ট বিষয়গুলো চলে আসে। একটা বয়স পর্যন্ত সে ছবি আঁকত এবং সাক্ষাৎকারে বলেছে,'ছবি আঁকতে না পারার বেদনাই আমাকে ছবি তোলার দিকে নিয়ে যায়।'[১৩] বাংলাদেশের নকশী কাঁথা ট্র্যাডিশান, বিশেষত গ্রামের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের চিত্র, তাকে ছবির বিষয় নির্ণয়ের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৯ সালে তোলা নদী ঘাটে ধোপাদের ছবিটা গোলাম কাশেম ড্যাডি প্রতিষ্ঠিত ক্যামেরা রিক্রিয়েশান ক্লাব-এর পুরস্কার পায়। এই অনুপ্রেরণায় আনোয়ার হোসেন পুরোদমে ফটোগ্রাফি চালিয়ে যায়, যা পরবর্তী দুই দশকে সোশাল রিয়ালিজমের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে দাঁড়ায়।

ফটোগ্রাফিতে বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে যখন ব্লক প্রিন্টের বদলে অফসেট প্রিন্ট পদ্ধতি চালু হয় ৬০-এর দশকে। এবার স্পষ্ট ভাবে ফটো ছাপাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, ফটোগ্রাফারের চাহিদাও বেড়ে যায়। ১৯৬০ সালেই ওবায়দুর রহমান ফিরোজ বাংলাদেশ অবজারভার-এ প্রথম স্টাফ নিউজ ফটোগ্রাফার নিযুক্ত হয়। এর পরে যখন রঙ্গীন ফটো ছাপা শুরু হয়, তখন প্রথমে গ্ল্যামার ফটো (১৯৬২) এবং পরে সাংবাদিকতা ফটো (১৯৬৫, অবজারভার) রঙিন প্রিন্টে দেখা যায়[১৪]। ফটোসাংবাদিকতার ক্রমাগত উত্থান ঘটতে থাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। নতুন দেশ, বহু নতুন পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং তার সাথে ফটোর চাহিদা বাড়তে থাকে। কিছু পত্রিকা এক ধরনের টু-টোন প্রিন্টিং করে– সাদাকালো ছবির উপরে রঙিন একটা শেড। অথবা মূল ছবিই থাকল, কিন্তু তার চারপাশে রঙিন একটা মার্জিন বা ডিজাইন। এই অলঙ্করণের ফলে কি ধরনের ছবি তোলা হচ্ছে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। একদিকে হয়ত আনোয়ার হোসেন তুলছে তার ১৯৭২ সালের 'টু দ্যা মার্কেট' (একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, দূরদিগন্তে বাজার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি।) অথবা ১৯৭৩ সালের 'দ্যা ফেরি' (প্রায় অসম্ভব সংখ্যক গরু নিয়ে নৌকা চালাচ্ছে মাঝি এবং তার ছোট্ট সহচর)। কিন্তু অন্যদিকে পত্রিকার অলঙ্করণের কারণে ফটোগ্রাফারদের বলা হচ্ছে ছবির বিষয় হতে হবে ববিতা, সালাউদ্দিন বা রুনা লায়লা।

অর্থাৎ স্বাধীনতার পরের দশকে উঠতি মিডিয়া জগৎ ফটোগ্রাফারদেরকে অল্প কিছু কর্মসংস্থান দেয়, কিন্তু একই সাথে রিয়ালিজম থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলে। বিশেষ করে যেহেতু আমানুল হক ও শামসুল ইসলাম আল মাজি বিচিত্রা'র জন্য বহু বছর ছবি তোলে, তাদের কাজ পত্রিকা ইলাস্ট্রেশান ধারায় চলে যায়। আর্থিক চাপ অনেক সময় লোকজনকে বাধ্য করে সুপারিশ মাফিক ছবি তুলতে। অনুমান করতে পারি ফটো সাংবাদিকের চাকরিটা শাঁখের করাতঃ না নিলেও নয় (বাঁচতে তো হবে) আবার নেয়ার পরে হয়ে যায় খাঁচা (কবে মুক্তি পাব)। এই মুক্তির পথ অবশেষে আসে ৮০'র দশকের শেষে দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগারের উত্থানের মাধ্যমে।

ডেভেলাপমেন্ট ডিসকোর্স এবং ফটোগ্রাফির নতুন ধারা

ফটোগ্রাফিতে যে পরিবর্তন এই সময়ে আসে, তার স্রোতে অনেকগুলো সংগঠনই উঠে আসে। তবে তার মধ্যে দৃক শীর্ষে। ৮০ এবং ৯০-এর দশকে বাংলাদেশি ফটোগ্রাফির আমূল পরিবর্তনকে বুঝতে হলে দৃককে একটা

ছবিঃ শহিদুল আলম/ দৃক/ মেজরিটি ওয়ার্ল্ড

সংস্থা হিসাবে না দেখে বরং একটা মেটাফর হিসাবে দেখা উচিৎ। এবং বিশেষ করে যেই ট্রেন্ডগুলো দানা বাঁধে এই সময়ের ফটোগ্রাফির পদ্ধতির মাধ্যমে, সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রথম বড় পরিবর্তন হল ডেভেলাপমেন্ট ডিসকোর্সের সাথে ফটোগ্রাফির যুক্তকরণ। এবং এই সংযুক্তি অলঙ্কার হিসাবে নয়, বরং ডিসকোর্সের মূল উপাদান হিসাবে। আমরা যদি ৭০ এবং ৮০-র দশকের কিছু ক্লাসিক ডেভেলাপমেন্ট বিষয়ক বইয়ের দিকে তাকাই তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এই সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই হল 'নীডলেস হাঙ্গার' (হারটম্যান ও বয়েস, ১৯৭৯) এবং 'আ কোয়ায়েট ভায়োলেন্স' (বেটসি হারটম্যান, ১৯৮৩)। বই দুটিতে পাতার পর পাতা নিখুঁত ইংরেজিতে বাংলার গ্রামের দারিদ্র্যের চিত্র আছে। এবং সব শেষে আছে, স্বাভাবিকভাবেই, সমাধান। বা সমাধান যদি সরাসরি নাও থাকে, একটা এনজিও এসে সেই সমাধান প্রস্তাব করবে। কিন্তু এই বই দুটিতে মলাটের ছবি ছাড়া আর কোন ছবি নাই। অর্থাৎ একটা ছবি যে হাজার শব্দের সমান, অথবা ছবি কথা বলে, এই চিন্তাগুলো তখনও এই সেক্টরে প্রাধান্য পায়নি।

পরবর্তীকালে যখন উন্নয়ন ডিসকোর্সে গদ্যের পাশাপাশি ছবি প্রাধান্য পেতে শুরু করে, তখন সোশাল রিয়ালিটি ভিত্তিক ছবি তোলার ভাষা, এবং তার পাশাপাশি এই ছবি প্রকাশ বা পাবলিকেশন আউটলেটও বদলে যায়। এই কথায় যাবার আগে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (বা বিপিএস) এর মূল সময়টার কথা বলি। বিপিএস যখন আশির দশকে পুরো উদ্যমে চলছে, সেটাকে অনেকে বাংলাদেশি আলোকচিত্রের 'স্বর্ণ যুগ' বলে। কিন্তু কেন এই কথা? সেই সময়ে ফটোগ্রাফাররা অনেক কষ্টে ছিল, যন্ত্রপাতি সরঞ্জামের অভাব ছিল, ছবি প্রকাশের জায়গা ছিল সীমিত। তারপরও আমার ধারণা এই সময়টাকে সবাই নস্টালজিয়া এবং ভালবাসার সাথে মনে রাখে কারণঃ (ক) তখন মাও সেতুং এর 'হাজার ফুল ফুটুক' জাতীয় একটা ইথোস ছিল,

ছবি: শেহজাদ নূরানি/ দৃক/ মেজরিটি ওয়ার্ল্ড, কান্দুপট্টি পতিতালয়

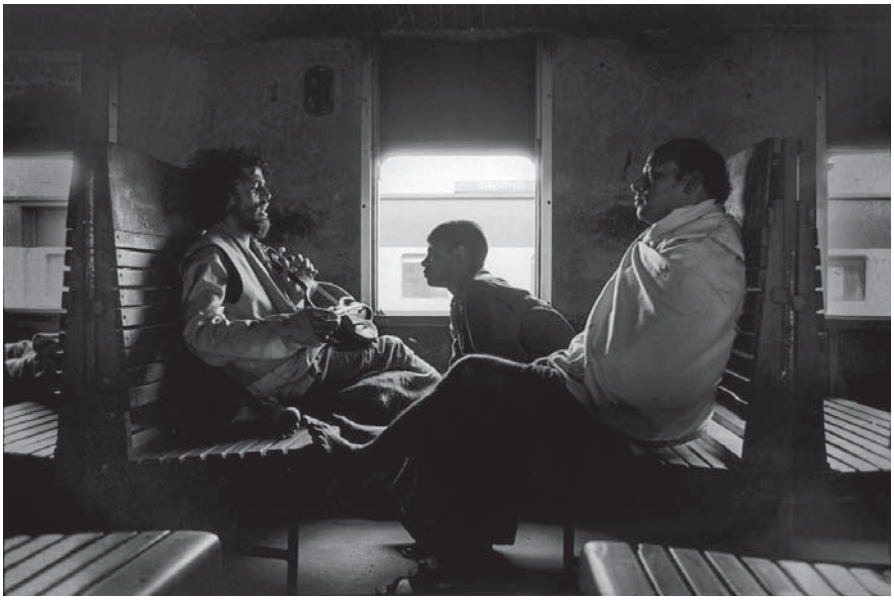

ছবি: হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন/ ম্যাপ, কমলাপুর রেলস্টেশন

ছবি: আবির আবদুল্লাহ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

ছবি: শফিকুল আলম কিরণ/ ম্যাপ, এসিড সারভাইভারস্, ১৯৯৮

এবং (খ) পাশ্চাত্য চোখ তখনও গ্লোবাল সাউথের দিকে যায়নি; তাই 'কার জন্য ছবি তুলছি' দুশ্চিন্তার প্রয়োজন ছিল না।

এই সময়ে এম. এ. বেগ বিপিএস-এ যুক্ত হবার ব্যাপারে শহিদুল আলমকে উৎসাহিত করে। পরবর্তীকালে শহিদুল আলমই নিয়ে আসে সোশাল রিয়ালিজমে সরাসরি রাজনীতির ধারা। বিপিএস'এ আরও ছিল মোহাম্মদ আলী সেলিম, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন, খালেদ মাহমুদ মিঠু, দেবব্রত চৌধুরী, ইত্যাদি। এই সময়ে স্যালন এবং পিক্টোরিয়াল ফটোগ্রাফির চল ছিল বেশি। ছবির বিষয়ের চাইতে কম্পোজিশান, আলো, সৌন্দর্য, ফর্ম, ইত্যাদি অনেক বেশি প্রাধান্য পেত। বিপিএস-এর একজন উপদেষ্টা অবশ্য আশাবাদী হয়ে বলে, 'আলোকচিত্র শুধু অত্যাচার ও দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ নয়, তার পাশাপাশি এই শহরের ক্ষমতাবান, ধনী বা শক্তিশালীদেরকে এই ব্যাপারে কিছু করতে উদ্দীপিত করে'[১৫]। শুধু ক্ষমতাবান লোকেরাই 'কিছু করবে' এই চিন্তাটা অবশ্য খুবই আপত্তিকর। ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ছিল আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত বাংলাদেশ লাইফ এন্ড কালচার[১৬] ফটো সংকলনটিতে। সেই সময়ে ডিএফপি থেকে প্রচুর চাপ আসে বইটিতে উরির চর বন্যাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনরত জেনারেল এরশাদের একটা ছবি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। আনোয়ার হোসেন বেঁকে বসে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, যার ফলে ডিএফপি বইটার খুব কম সংখ্যক কপি ছাপায় (এ কারণেই বইটা আজকাল দুর্লভ)। বইটাতে যদিও সোশাল রিয়ালিজমের অনেক বিষয় চলে আসে (নামাজি, ফেরিওয়ালা, গির্জা, চায়ের দোকান, কৃষক), তবে ক্যাপশন এবং তথ্যের অভাবে সংকলনটি কিছুটা পঙ্গু হয়ে থাকে (পরবর্তী দশকে পরিবেশনার এই ধরনটি পুরোপুরি বদলে যায়)। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সোশাল ডকুমেন্টারি এই ধরনের আছে-নাই অস্পষ্টতার মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। এসব কিছু বদলে যায় বিপিএস থেকে শহিদুল আলমের বিদায় এবং নিজস্ব সংগঠন দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগারের উদ্বোধনের মাধ্যমে।

দৃকের সাফল্য নিয়ে অন্যত্র অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, তাই এখানে পুনর্বয়ান করব না। শুধু সংক্ষেপে বলব যে, দৃক একইসাথে আলোকচিত্রকে প্রফেশান হিসাবে দাঁড় করিয়েছে, বিদেশে আমাদের ছবি প্রকাশের বাজার তৈরি করেছে, কপিরাইটের উপর জোর দিয়ে রয়ালিটি উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে, এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফার ক্যাটেগরি তৈরি করেছে। এছাড়া, ফর্মে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা এসেছে দীর্ঘ ফটো স্টোরির মাধ্যমে (এর আগে ছিল শুধুই সিংগল শট)। আর সব কিছু ছাড়িয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল দৃক সোশাল রিয়ালিজমকে ফটোশিল্পের চূড়া হিসাবে স্থাপন করেছে। বিশেষত প্রান্তিক জনগণকে নিয়ে আলোকচিত্র হয়ে গেছে বাংলাদেশের ডমিন্যান্ট প্যারাডাইম।

৮০'র দশকের শেষ দিকে শুরু হয় সোশাল রিয়ালিজমের বর্ধিত যাত্রা। এরশাদ সরকারের পতনের পরে সেনসরশিপ থেকে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মুক্তি ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত যেই সামরিক সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা বাস্তব ঘটনা এবং সমস্যা নিয়ে কোন রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ হতে দিত না। এরশাদ সরকারের পতনের পরে যখন মিডিয়ার উপর খবরদারি কমে যায়, অনেক ফটোগ্রাফারই সেই না-বলা ঘটনাগুলোর ব্যাপারে উৎসাহী হয়। পাশাপাশি নতুন একটা ধারা চলে আসে, যেটি হল শহরের প্রান্তিক মানুষের ছবি তোলা (যা আগের যুগের গ্রামের রোমান্স থেকে একেবারে আলাদা)। আন্তর্জাতিকীকরণের কারণে বিদেশি ফটোগ্রাফাররাও বাংলাদেশে আসা শুরু করে। শহিদুল আলম এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পী এসে তাদের কাজ দেখায়, বিশেষত স্টিভ কনল্যান ও পিটার ফ্রায়ার। তাদের কাজ পরবর্তীতে দেশি সোশাল রিয়ালিজমকে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবেই কাজগুলো শুধু দৃকের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ম্যাপ এবং অন্যান্য সংগঠনের আলোকচিত্রীরাও সোশাল রিয়ালিজমের

ছবি: আসাদ কে সৈয়দ, দ্যা প্রবলেম, ১৯৫০

উপর জোর দেয়। ৮০ এবং ৯০'র দশকে বের হয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে আছে হাসান সাইফুদ্দিন চন্দনের 'দা পিপল অ্যাট কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন' (ভাসমান প্রান্তিক মানুষ), শহিদুল আলমের 'স্ট্রাগল ফর ডেমোক্র্যাসি' (এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও ধনী-গরিবের পাশাপাশি জীবন)[১৭], শেহজাদ নুরানি'র 'রাতের কন্যা' (যৌনকর্মী), শফিকুল কিরণের 'এসিড ভিকটিম', আবির আবদুল্লাহ'র 'ওয়ার ভেটারান' ('৭১-এর পঙ্গু যোদ্ধারা), ইত্যাদি। বিশেষত শহিদুল তার কাজে আয়রনিক কন্ট্র্যাস্টের ব্যাপারে জোর দেয়। শুধু গরিব লোক নয়, তার পাশাপাশি উঠতি ধনী শ্রেণীকেও সে ধরে রাখে ক্যামেরায়। হোটেলে বিয়ে, আড়ংয়ে কেনাকাটা, এমনকি টিভি দেখার সময়ে মালিক–চাকর অ্যাপারথাইড প্রথা ছবিতে চলে আসে।

লক্ষ করা যায়, এই সময়ে সোশাল ডকুমেন্টারি ভাষায় একটা গ্রামার চলে আসে। ছবিগুলো অনেক সময় গভীর এবং স্টার্ক সাদা কালো (রঙিন ছবি এই ধারার মধ্যে ব্যতিক্রম)। ফ্রেমের সেন্টার পয়েন্টে যে সাবজেক্ট, তা এমন শার্প ফোকাসে আছে যে তাকাতে চোখে 'ব্যথা লাগে'। আরও দেখা যায় এক ধরনের উত্তেজক হার্ড কন্ট্র্যাস্ট, যা বিশেষত পরবর্তী ফটোশপ প্রযুক্তির যুগে আরও বেশি সম্ভব হয়। (আমার এক ভারতীয় বন্ধু একবার এক ছবি দেখিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তোমাদের বাংলাদেশে আকাশের মেঘ এমন স্টার্ক ও সুন্দর হয় কিভাবে?' আমি জবাব দেই, 'ডজ বার্ন'।) টেকনিক্যাল বিষয়গুলো ছাড়াও কাজগুলিতে কিছু থিম দেখা যায়ঃ ধারাবাহিক গল্প, সেন্ট্রাল কোন এক ব্যক্তি, সাবজেক্টের সাথে অনেক সময় কাটানো, ইত্যাদি। এর মাঝে যে কয়েকটা কাজ একটু অন্যদিকে যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিজড়াদের নিয়ে জি. এম. বি. আকাশের কাজ। সেখানে রঙ্গের আধিক্য (হিজড়াদের জীবনে আনন্দের আধিক্য, না ক্যামেরার কালার স্যাচুরেশান?) আর ওয়াইড অ্যাংগল লেন্সের মধ্যে এক ধরনের বেয়াদবি চলে আসে। এই বেয়াদবি সোশাল রিয়ালিজম মূলধারা গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

আলোকচিত্রের সাপ্লাই দিক (বাংলাদেশ) থেকে সরে এবার একটু ডিমান্ড সাইডের দিকে তাকাই। আগেই বলেছি, ডেভেলাপমেন্ট নেটওয়ার্ক ও ডিসকোর্সে এক সময় ছবির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, এমনকি কেন্দ্রীয় হয়ে পড়ে। পশ্চিমারা চায় বিশেষ কিছু কনসেপ্টঃ (ক) পরিস্থিতি খুব খারাপ, কিছু একটা কর, (খ) আমাদের কাজের ফলাফল দেখা যাচ্ছে, (গ) কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবী।

(গ) এর ট্রেন্ড অবশ্য অনেক আগে থেকেই শুরু। এমনকি ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের 'পপুলার ফটোগ্রাফি' পত্রিকা (দাম মাত্র ৫০ সেন্ট!) খুললে পৃ. ১১০ এ দেখি আসাদ কে. সৈয়দের ছবি। কয়েকজন ভিখারি রাস্তায় ঘুমাচ্ছে, একজন চোখ ঢেকে চিৎকার করছে, তার শুকনো স্তনে বাচ্চার মুখ। ছবির ক্যাপশান? আর কি হবে... 'দ্যা প্রবলেম' (সমস্যা)! হ্যাঁ, এই ছবি আমরা শামসুল ইসলাম আল মাজি এবং অন্যের কাজেও দেখেছি। যাহা ১৯৫০, তাহা ১৯৭৫, তাহাই...?

যাহোক, গরিবত্বের মাঝে মাহাত্ম্য কনসেপ্টের বাইরেও ডিমান্ডের আরেকটা দিক আছে। সেটা হল নর্দার্ন দেশগুলোর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংকট, এবং সেই সংকট থেকে বের হয়ে আসতে রং বা 'ডাইভার্সিটি'র প্রয়োজন– যেটা গ্লোবাল সাউথ দিতে পারে। অর্থাৎ 'ওয়াইট লিবারাল গিল্ট' বা সাদা প্রগতিবাদীদের অপরাধবোধ একটা বড় ব্যাপার। তারা আমাদের কাছ থেকে চায় প্রাচ্যের 'সরল জীবন', 'প্রাচীন জ্ঞান'। অনেক সময় ঠাট্টাচ্ছলে বলি, বিটলস যেভাবে অতি সাফল্যের চাপে ব্যাকুল হয়ে ভারতে চলে আসে সেতার বাজানো শিখতে। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। কথাগুলো কিছুটা বক্রোক্তি মনে হলেও, বিষয়টা রয়ে যায়। সোশাল রিয়ালিজম বাংলাদেশের একটা শক্তিশালী ধারা, এবং তা প্রচলিত অনেক শক্তির কেন্দ্রকে জোরে ধাক্কা দেয়। কিন্তু একই সাথে, এর উত্থানটি পশ্চিমের একটা বিশেষ প্রয়োজনের সাথেও কিছুটা যুক্ত

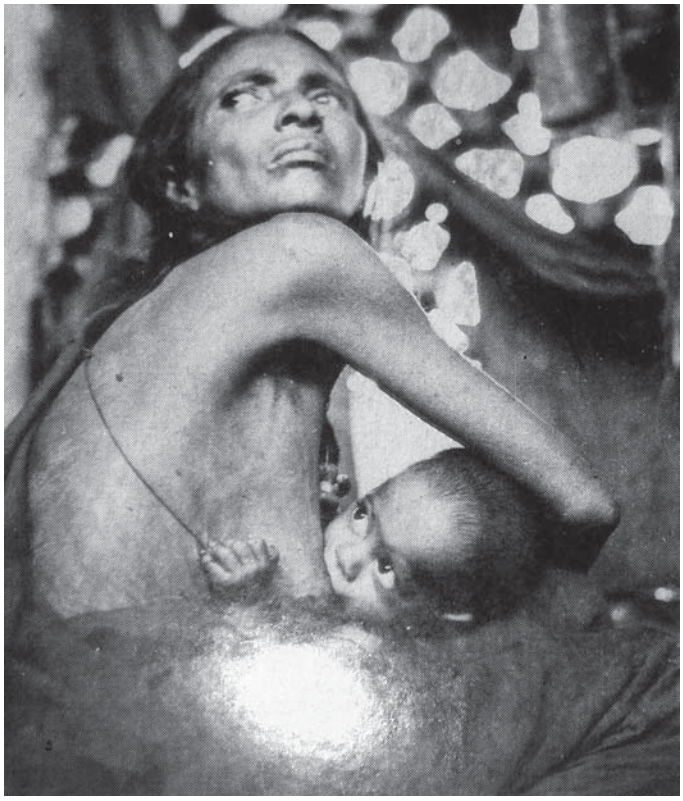

ছবি: শামসুল ইসলাম আল মাজি, যেহেতু মানুষ মানুষই, ১৯৭৫

(ডেভেলাপমেন্ট ডিস্কোর্স, এনজিও কর্মকাণ্ড, পুরস্কার ও ফেস্টিভাল সার্কিট, ডাইভার্সিটি বা রঙের ছিটা, এবং পশ্চিমা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার টনিক)।

সোশাল রিয়ালিজম এর পরবর্তী অধ্যায়

সব কিছুর একটা এ্যান্ড-স্টেইট আসে, যখন ক্লান্তির জায়গাগুলো চোখে পড়ে। সোশাল রিয়ালিজমের ধারায় এ ধরনের একটা ক্লান্তি হয়ত একটু একটু এসে গেছে।

এক সময়ে, সাদা পুরুষ ফটোগ্রাফাররা এসে হোটেল শেরাটনে উঠত। হোটেলের খুব কাছের বস্তিটার ছবি তুলে পরদিন প্লেনে করে চলে যেত। তার এক সপ্তাহ পর নিউ ইয়র্ক টাইমস সেই বস্তির ছবি ছাপাত, দেশের ইমেজটা নষ্ট হত, ইত্যাদি। কিন্তু ২০১২ সালে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বীকার করতে হবে, এই যুদ্ধে আমরা এখন জয়লাভ করেছি। সাদা আলোকচিত্রীরা এখন সাহস পায় না সেই শেরাটন-বস্তি-এয়ারপোর্ট মানচিত্র অনুসরণ

করতে। তার বদলে তারা স্থানীয় কারও বাড়িতে ওঠে, আমাদের সাথে (হাত দিয়ে) ভাত খায়, এবং আমাদের নির্দেশনায় ছবি তোলে। কেউ যেন না ভাবে যে, আমি সেই আগের শেরাটন প্যারাডাইমে ফিরতে চাই। কখনই না! অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল। এবং এই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য দৃক, ম্যাপ, বিপিএস, ইত্যাদি সবাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন রয়ে যায়– এত কিছুর পরেও কেন পশ্চিমা ফটোগ্রাফারের আগমনে ইতিহাসের চাকা চালু হয়? আমাদের অভ্যন্তরীণ, ইন্ডিজেনাস ধারাটা বাইরের সাহায্য (পুরস্কার, ফেস্টিভাল, কিউরেটার, পত্রিকা, এজেন্সি, ইত্যাদি) ছাড়া চলতে পারবে কবে? বিশেষত দেশীয় সংগঠন (মিডিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, ইত্যাদি) কেন এখনও আলোকচিত্রকে এত কম (আর্থিক/ সামাজিক) মূল্য দেয়?

আরেকটা বড় প্রশ্ন হলঃ ধরা যাক আজকে সেই বস্তির ছবিটা একজন বাঙালি তুলল। তারপর সেটা নিউ ইয়র্ক টাইমস ছাপল। তাহলে কি আমরা প্যারাডাইম ভাঙলাম, নাকি বিলেতিদের বদলে নিজেদেরকে বসালাম (অবশ্য দৃকের 'ফোকাসের বাইরে' প্রকল্পটি এর জবাব দেবার চেষ্টা করে)? আর যদি কিছু বাঙালি সেই ছবি তুলে শেষে বিদেশে বাজারজাত করে, তাহলে 'বিদেশিরা আমাদের এখানে এসে...' এই 'অত্যাচারিত' স্বরে ডিসকোর্স কেন চলে? এই 'ভিক্টিম' ইমেজ তৈরি করার রাজনীতিতে আমাদের নিজেদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলি না কেন আমরা? অর্থনৈতিক অসমতার আলোচনায় এই কথা আসা দরকার যে ঢাকা শহরে যে পরিমাণ দামি ক্যামেরা সরঞ্জাম আছে, তা ফটোগ্রাফি-সৃষ্ট একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক সার্কিটের ইঙ্গিত দেয় (যদিও প্রধান ক্রেতারা বিদেশি সংস্থা, এবং দেশি-বিদেশি জয়েন্ট ভেঞ্চার)।

বর্তমান ধারার সোশাল ডকুমেন্টরির 'বাস্তবতা তৈরি'র ব্যাপারেও কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় এসেছে। ১৯৭১-এর সেই আইকনিক ছবি (তিন যোদ্ধা, একেকজনের হাতে একেক অস্ত্র)[১৮] দেখলে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে পোজ করা। বা কঙ্কালের উপর শকুনের ছবি দেখলে বোঝা যায় দুটি ছবির কম্পোসিট। ঠিক তেমনি বর্তমানের অনেক সোশাল রিয়ালিজম ধারার ছবি দেখলে আশঙ্কা হয় একটা মরীচিকা তৈরি করা হচ্ছে কি? নকল পোজ দিয়ে নয় (ওই ধরনের রূঢ় ম্যানিপুলেশান অনেকটা কমে গেছে), মরীচিকাটা অন্য জায়গায়– পরিবেশনায়। ছবি কোথায় দেখানো হচ্ছে, কোন এনজিও'র কাজে ব্যবহার হচ্ছে (অফুরন্ত এসিড সার্ভাইভার তহবিল!), কি গদ্য দেয়া হচ্ছে ক্যাপশানে, আলোকচিত্রী নিজেকে কিভাবে পরিবেশন করছে (হিরো, ভুক্তভোগী বা পরিত্রাণকারী)– এসব কিছুই আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

বর্তমান প্রজন্মের অনেক ফটোগ্রাফার ঢাকা শহর বা অন্য শহরে বড় হওয়া। অনেকেই আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা (বিশেষত যতই আলোকচিত্র একটা সম্মানজনক, লাভজনক এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফেশনাল ট্র্যাক হয়ে যাচ্ছে)। অথচ তাদের মধ্যে এক বড় অংশ গ্রামের সমস্যা, নদীর ভাঙন, ইত্যাদি নিয়ে ছবি তুলছে বেশি এবং তার সাথে ফান্ডিং ক্যাটেগরি মিলে যাচ্ছে। বিশেষত গত ৫ বছরে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' বা 'জলবায়ু পরিবর্তন' একটা বড় অর্থায়নের উৎস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের দেশে। এবং এর মধ্যে একইসাথে নিজেদেরকে 'ভিক্টিম', 'মারটির' এবং পরিত্রাণের যোগ্য বলে পরিবেশন করা যায় (যে ছবি তুলছে, তার নিজস্ব উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে যাচ্ছে এই সমীকরণে)।

অনেক সময় ফান্ডিং উৎস একটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশা দেয়, কিন্তু ভেতরের ফাউন্ডেশন কাঁচা থেকে যায়। যেমন, সমকামী ভালবাসা নিয়ে ফটো ফিচার দেখলে মনে হবে যে, সামাজিক চিন্তা অনেক প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু ফেইসবুকে এই ধরনের ছবির নিচে দর্শকের উগ্র মন্তব্য দেখলেই বোঝা যাবে সামাজিক সংকীর্ণতা এখনও কাটেনি। বরং পুরস্কারপ্রাপ্ত 'সমকামী জীবন' ছবির ঠিক আড়ালেই আছে সমকামীদেরকে রাস্তায় পিটিয়ে

হত্যা করার সম্ভাবনা । তখন কি পুরস্কার, বা পুরস্কারপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী, এই সম্প্রদায়কে বাঁচাতে পারবে?

তাই আজ খুব দরকার ছবি তোলার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করা । আলোকচিত্রীদের শুধু ছবি তুলে ক্ষান্ত হলে চলবে না, সরাসরি আন্দোলনের কাজে যুক্ত হতে হবে । প্রয়োজনে ক্যামেরা কাঁধ থেকে কিছু সময়ের জন্য নামিয়ে রাখতে হতে পারে ।

ভাঙন থেকে আবারও নতুন কিছুর উৎপত্তি ।

তথ্যসূত্রঃ

১. সুকুমার রায়, 'ফটোগ্রাফি', পুনঃমুদ্রণঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, ছবি তোলাঃ বাঙ্গালির ফটোগ্রাফি চর্চা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ. ২৭৮

২. সিদ্ধার্থ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩. তানজিম ওয়াহাব, 'আমানুল হক', কামরা খণ্ড-১, পৃ. ১৪৬

৪. শোভন সোম, 'জয়নুল আবেদিন', নিরন্তর, পৃ. ৯৩

৫. শোভন সোম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৬. অনুপম হায়াৎ, 'আলোকচিত্র (১৮৪০-১৯৭০)', বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮৪: চারু ও কারুকলা, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৩৯৫

৭. নাসির আলী মামুন, 'পূর্ব বাংলার ফটোগ্রাফিঃ রাজ সাক্ষী গোলাম কাশেম ড্যাডি', ইত্তেফাক, ঈদ সংখা, আগস্ট ২০১১

৮. রফিউল ইসলাম সম্পাদিত, 'আমার বাংলা, নাইব উদ্দিন আহমেদ', প্রজ্ঞা, ২০০৯

৯. শাওন আকন্দ, 'জয়নুলের 'সংগ্রাম' নিয়ে কিছু কথা', শিল্পরূপ, তৃতীয় বর্ষ, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৯ । শহিদুল আলমের কাছেও নাইব উদ্দিন বলেছে যে ফটোটি আগে তোলা (লেখকের সাথে আলাপ, জুলাই ২০১২) ।

১০. ডিপার্ট, 'লুকিং থ্রু দ্যা লেনস স্টার্কলিঃ নাইব উদ্দিনের 'আমার বাংলা', ১ম সংখ্যা

১১. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, ২০০৭, পৃ. ৩৯৮

১২. দৃক, ১৯৯৬ বর্ষপঞ্জি, 'স্বাধীনতার ২৫তম বছর'

১৩. লেখকের সঙ্গে আলাপ, ২১ জুলাই, ২০১২ ।

১৪. শহিদুল আলম, 'বাংলাদেশঃ আ ওয়েলথ অফ ট্যালেন্ট', ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো নিউজলেটার, ৪র্থ কোয়ার্টার, ১৯৯৩

১৫. ব্রিগেডিয়ার (অব.) আতিক উর রহমান, 'বাংলাদেশ আলোকচিত্রের বিকাশ', বাংলাদেশ অবজারভার, ২ নভেম্বর, ১৯৮২

১৬. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ লাইফ এন্ড কালচার, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশনস, ১৯৮৬

১৭. শহিদুল আলম, মাই জার্নি এজ আ উইটনেস, স্কিরা/ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ২০১১

১৮. নাইব উদ্দিন, 'আমার বাংলা', জাতীয় যাদুঘর, ৭–১৩ নভেম্বর, ২০০৯